Dr. Milton Biswas
Professor
Bangla Department
Jagannath University Dhaka.

ছেলে-ভুলানো ছড়া

বাংলাভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে-একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।

আমার কাছে কোন্‌টা ভালো লাগে বা না লাগে সেই কথা বলিয়া সমালোচনার মুখবন্ধ করিতে ভয় হয়। কারণ, যাঁহারা সুনিপুণ সমালোচক, এরূপ রচনাকে তাঁহারা অহমিকা বলিয়া অপরাধ লইয়া থাকেন।

কিন্তু আজ আমি যে কথা বলিতে বসিয়াছি তাহার মধ্যে আত্মকথার কিঞ্চিৎ অংশ থাকিতেই হইবে। ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি, ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেই ছড়াগুলির মাধুর্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতি এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণশক্তি বর্তমান লেখকের নাই। এ কথা গোড়াতেই কবুল করা ভালো।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না, ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই-সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

এই-সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন্‌ শকের কোন্‌ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্ন কাহারো মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।

ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা-অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে,

কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে ; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে— অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন ; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুলপরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য ; তাহারা মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।

আপনি জন্মিয়াছে এ কথা বলিবার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে।— স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প— এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশসকল সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেরূপ। সেখানেও আমাদের নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ গন্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহারজগতের কতশত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত অনাবশ্যক ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

যখন আমরা সচেতনভাবে কোনো-একটা বিশেষ দিকে লক্ষ করিয়া চিন্তা করি তখন এই-সমস্ত গুঞ্জন থামিয়া যায়, এই-সমস্ত রেণুজাল উড়িয়া যায়, এই-সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয় ; আমাদের কল্পনা, আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আকাশে পাখির ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোটো বড়ো কত সহস্র প্রকার কলশব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে— এবং আমাদের চতুর্দিকে কত কম্পন, কত আন্দোলন, কত গমন, কত আগমন, ছায়ালোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে— অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে ; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে এক খেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে যখন দেখে তখন ভালো করিয়া শোনে না, যখন শোনে তখন ভালো করিয়া দেখে না এবং সে যখন চিন্তা করে তখন ভালো করিয়া দেখেও না শোনেও না। তাহার উদ্দেশ্যের পথ

হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দূর করিয়া দিতে পারে।

কিন্তু সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে-সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ-পরিবর্তন-পূর্বক ক্রমাগত মেঘ-রচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়তপরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম, ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে এইখানে দুই-একটি ছড়া উদ্‌ধৃত করিবার পূর্বে পাঠক-দের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি। প্রথমত, এই ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে, আমার মতো মর্যাদাভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে। পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে, আপন বাল্যস্মৃতি হইতে সেই সুধাস্নিগ্ধ সুরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সংগীতটি, যে সন্ধ্যাপ্রদীপালোকিত সৌন্দর্যচ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে, সে আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব।

দ্বিতীয়ত, আটঘাট-বাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই-সমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়, যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা। কিন্তু উপায় নাই। আদালতের নিয়মে আদালতের কাজ হয়, প্রবন্ধের নিয়মানুসারে প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়,— নিষ্ঠুরতাটুকু অপরিহার্য।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজিফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুমঝুম পা-ঝুমঝুমে সীতারামের খেলা॥
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥

আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট॥
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে॥
ওড়ফুল কুড়োতে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্ষুর বেলা॥

ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পরসম্বন্ধ নাই, সে কথা নিতান্ত পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে কোনো-প্রকার বাছ-বিচার নাই। যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান বেটা দিব্য পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো ভাবগুলো কোনোপ্রকার পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনোরূপ উপলক্ষ অন্বেষণ না করিয়া, অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমন-কি, মাঝে মাঝে লঘু-করস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে। দ্বারবানটা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত, তবে সেই মুহূর্তেই তাহারা কে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যাইত না।

যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন, আগামী কল্য যে তাঁহার শুভবিবাহ সে কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিবাহের পর যথাকালে কাজিতলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে, সে কথা আপাতত উত্থাপন না করিলেও চলিত ; যাহা হউক, তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোনোপ্রকার উদ্‌যোগ অথবা সেজন্য কাহারো তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে, এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে। সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে যে, কাহাকেও কোনো-কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাকে বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে। কাজিফুল যে কী ফুল আমি নগরবাসী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতেছি যে, যমুনাবতী-নামক কন্যাটির আসন্ন বিবাহের সহিত উক্ত পুষ্পসংগ্রহের কোনো

যোগ নাই। এবং হঠাৎ মাঝখান হইতে সীতারাম কেন যে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর ঝুম্‌ঝুম্‌ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গ কারণ দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মস্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আকস্মিক নৃত্য হইতে ভুলাইয়া হঠাৎ ত্রিপূর্ণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দুটি মৎস্য ভাসিয়া উঠা কিছুই আশ্চর্য নহে বটে, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুটি মৎস্যের মধ্যে একটি মৎস্য যে লোক লইয়া গেছে তাহার কোনোরূপ উদ্দেশ না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতা কী কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ স্থিরসংকল্প হইয়া বসিলেন, অথচ প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়ফুল সংগ্রহ দ্বারাই শুভকর্মের আয়োজন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন তাহাও নূতন অথবা পুরাতন কোনো পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশস্ত নহে।

এই তো কবিতার বাঁধুনি। আমাদের হাতে যদি রচনার ভার থাকিত তবে নিশ্চয় এমন কৌশলে প্লট বাঁধিতাম যাহাতে প্রথমোক্ত যমুনাবতীই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সেই ত্রিপূর্ণির ঘাটে অনির্দিষ্ট ব্যক্তির অপরিজ্ঞাত ভগ্নীরূপে দাঁড়াইয়া যাইত এবং ঠিক মধ্যাহ্নকালে ওড়ফুলের মালা বদল করিয়া যে গান্ধর্ববিবাহ ঘটিত তাহাতে সহৃদয় পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিতেন।

কিন্তু বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎসংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর-একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস-জগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না, কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাববশতই বাল্যস্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মুহূর্তের মধ্যেই মুঠামুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়—মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূম করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাজ করা আবশ্যক, সেখানে কর্তাকেও অবিলম্বে কাজের নিয়ম

মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না, সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এইজন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্তলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে।

পূর্বোদ্ধৃত ছড়াটিতে সংলগ্নতা নাই, কিন্তু ছবি আছে। কাজিতলা, ত্রিপূর্ণির ঘাট এবং ওড়বনের ঘটনাগুলি স্বপ্নের মতো অদ্ভুত, কিন্তু স্বপ্নের মতো সত্যবৎ।

স্বপ্নের মতো সত্য বলাতে পাঠকগণ আমার বুদ্ধির সজাগতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই পণ্ডিত স্বপ্নকে উড়াইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ সত্য নাই— তবে কী আছে। না, স্বপ্ন আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রবল যুক্তির দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা সহজ কিন্তু স্বপ্নকে অস্বীকার করিবার জো নাই। কেবল সজাগ স্বপ্ন নহে, নিদ্রাগত স্বপ্ন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতেরও সাধ্য নাই স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে অবিশ্বাস করেন। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা সম্ভব সত্যকেও সন্দেহ করিতে ছাড়েন না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাঁহারা চরমতম অসম্ভবকে অসংশয়ে গ্রহণ করেন। অতএব, বিশ্বাসজনকতা নামক যে গুণটি সত্যের সর্বপ্রধান গুণ হওয়া উচিত, সেটি যেমন স্বপ্নের আছে এমন আর কিছুরই নাই।

এতদ্দ্বারা পাঠক এই কথা বুঝিবেন যে, প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য। এইজন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

এ বয়সে এই ছড়াটি শুনিবামাত্র বোধ করি প্রথমেই মনে হয়, শিবুঠাকুর যে তিনটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে মধ্যমা কন্যাটিই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। কিন্তু এক বয়স ছিল যখন এতাদৃশ চরিত্রবিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। তখন এই চারিটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূতের মতো ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তালতরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম, সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটিদুয়েক পানসি নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবুঠাকুরের নববিবাহিতা বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, শিবুঠাকুরের জীবনটিকে বড়ো সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইত। এমন-কি, তৃতীয়া বধূঠাকুরানী মর্মান্তিক রাগ করিয়া দ্রুতচরণে বাপের বাড়ি অভিমুখে চলিয়াছেন, সেই ছবিতেও আমার এই সুখচিত্রের কিছুমাত্র ব্যাঘাত-সাধন করিতে পারে নাই। এই নির্বোধ তখনো বুঝিতে পারিত না, ঐ একটিমাত্র ছত্রে হতভাগ্য শিবুঠাকুরের জীবনে কী-এক হৃদয়বিদারক শোকাবহ পরিণাম সূচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, চরিত্রবিশ্লেষণ অপেক্ষা চিত্রবিরচনের দিকেই তখন মনের গতিটা ছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি, হতবুদ্ধি শিবুঠাকুর তদীয় কনিষ্ঠ জায়ার অকস্মাৎ পিতৃগৃহপ্রয়াণদৃশ্যটিকে ঠিক মনোরম চিত্র হিসাবে দেখেন নাই।

এই শিবুঠাকুর কি কস্মিন্ কালে কেহ ছিল, এক-একবার এ কথাও মনে উদয় হয়। হয়তো-বা ছিল। হয়তো এই ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর-কোনো ছড়ায় হয়তো-বা ইহার আর-এক টুকরা থাকিতে পারে।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর॥
শিব গেল শ্বশুরবাড়ি বসতে দিল পিঁড়ে।
জলপান করিতে দিল শালিধানের চিঁড়ে॥
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খই।
মোটা মোটা সবুরি কলা, কাগমারে দই॥

ভাবে-গতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে শিবুঠাকুর এবং শিবু সদাগর লোকটি একই হইবেন। দাম্পত্যসম্বন্ধে উভয়েরই একটু বিশেষ শখ আছে এবং বোধ করি আহারসম্বন্ধেও অবহেলা নাই। উপরন্তু গঙ্গার মাঝখানটিতে যে স্থানটুকু নির্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাও নব পরিণীতের প্রথমপ্রণয়যাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান।

এই স্থলে পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, প্রথমে অনবধানতাক্রমে শিবু সদাগরের জলপানের স্থলে শালিধানের চিঁড়ার উল্লেখ করা হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে, 'শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খই'। যেন ঘটনার সত্যসম্বন্ধে তিলমাত্র স্খলন হইবার জো নাই। অথচ এই সংশোধনের দ্বারা বর্ণিত ফলাহারের খুব যে একটা ইতরবিশেষ হইয়াছে,

জামাই-আদর সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ির গৌরব খুব উজ্জ্বলতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির মর্যাদা অপেক্ষা সত্যের মর্যাদা রক্ষার প্রতি কবির যে অধিক লক্ষ দেখা যাইতেছে, তাও ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি ইহাও স্বপ্নের মতো। বোধ করি শালিধানের চিঁড়া দেখিতে দেখিতে পরমুহূর্তে বিন্নিধানের খই হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি শিবুঠাকুরও কখন এমনি করিয়া শিবু সদাগরে পরিণত হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না।

শুনা যায়, মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন, একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুকরা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই-সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

অবশ্য বালকের কল্পনা এই ঐতিহাসিক ঐক্য রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না।

নিম্নোদ্‌ধৃত ছড়াটিতে অসংলগ্ন ছবি যেন পাখির ঝাঁকের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দ্রুত গতিতে বালকের চিত্ত উপর্যুপরি নব নব আঘাত পাইয়া বিচলিত হইতে থাকে।

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড়োসাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে॥
দু-পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে॥
ওপারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে।
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে॥
কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্‌খান দে, বকুলতলা দে॥
বকুলফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্যি বাজে সীতেনাথের খেলা॥

সীতেনাথ বলে রে ভাই চাল কড়াই খাব।
চাল কড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ॥
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্‌ করে।
সোনামুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

ইহার মধ্যে কোনো ছবিই আমাদিগকে ধরিয়া রাখে না, আমরাও কোনো ছবিকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ঝোটনবিশিষ্ট নোটনপায়রাগুলি, বড়োসাহেবের বিবিগণ, দুই পারে ভাসমান দুই রুইকাৎলা, পরপারে স্নাননিরত দুই মেয়ে, দাদার বিবাহ, রামধনুকের বাদ্যসহকারে সীতানাথের খেলা, এবং মধ্যাহ্নরৌদ্রে তপ্তবালুকাচিক্কণ মাঠের মধ্যে খরতাপক্লিষ্ট রক্তমুখচ্ছবি—এ সমস্তই স্বপ্নের মতো। ওপারে যে দুইটি মেয়ে নাহিতে বসিয়াছে এবং দুই হাতের চুড়িতে চুড়িতে ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ করিয়া চুল ঝাড়িতেছে তাহারা ছবির হিসাবে প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে অপরূপ স্বপ্ন।

এ কথাও পাঠকদের স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, স্বপ্ন রচনা করা বড়ো কঠিন। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। সংসারের সকল কার্যেই আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গেছে যে, সহজ ভাবের অপেক্ষা সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না ডাকিলেও ব্যস্তবাগীশ চেষ্টা সকল কাজের মধ্যে আপনি আসিয়া হাজির হয়। এবং সে যেখানেই হস্তক্ষেপ করে সেইখানেই ভাব আপন লঘু মেঘাকার ত্যাগ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহার আর বাতাসে উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন ; সহজের প্রধান লক্ষণই এই।

পাঠক বোধ করি ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের প্রথমোদ্‌ধৃত ছড়াটির সহিত এই ছড়া কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন মেঘে মেঘে স্বপ্নে স্বপ্নে মিলাইয়া যায়, এই ছড়াগুলিও তেমনি পরস্পর জড়িত মিশ্রিত হইতে থাকে, সেজন্য কোনো কবি চুরির অভিযোগ করেন না, এবং কোনো সমালোচকও ভাববিপর্যয়ের দোষ দেন না। বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার-নির্ণয় নাই। সেখানে পুলিস বা আইনকানুনের কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না।

অন্যত্র হইতে প্রাপ্ত নিম্নের ছড়াটির প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখুন।

ওপারে জন্তিগাছটি জন্তি বড়ো ফলে।
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে॥
প্রাণ করে হাইঢাই গলা হল কাঠ।
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ॥
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান।
পান কিনলাম, চুন কিনলাম, ননদে ভাজে খেলাম।
একটি পান হারালে দাদাকে ব'লে দেলাম॥
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইকো বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি॥
আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগ্‌নগর দিয়ে॥
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।
মোটামোটা চুলগুলি গো পেতে বসেছে॥
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে নেগেছে।
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ নেগেছে॥
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে।
পরনে তাদের ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে॥
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে
নাল গামছা দিয়ে॥
অশথের পাতা ধনে।
গৌরী বেটি ক'নে॥
নকা বেটা বর।
ঢ্যাম কুড়্‌কুড়্ বাদ্দি বাজে চরকডাঙায় ঘর॥

এই-সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। প্রথম ছড়ায় দেখিয়াছি আলোচাল খাইয়া সীতারাম-নামক নৃত্যপ্রিয় লুব্ধ বালকটিকে ত্রিপূর্ণির ঘাটে জল খাইতে যাইতে হইয়াছিল; দ্বিতীয় ছড়ায় দেখিতে পাই সীতানাথ চালকড়াই খাইয়া জলের অন্বেষণে চিৎপুরের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় ছড়ায় দেখা যাইতেছে— সীতারাম নহে, সীতানাথও নহে, পরন্তু কোনো-এক হতভাগিনী

ভ্রাতৃজায়ার বিদ্বেষপরায়ণা ননদিনী জন্তিফল ভক্ষণের পর তৃষাতুর হইয়া হরগৌরীর মাঠে পান খাইতে গিয়াছিল এবং পরে অসাবধানা ভ্রাতৃবধূর তুচ্ছ অপরাধটুকু দাদাকে বলিয়া দিবার জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই তো তিন ছড়ার মধ্যে অসংগতি। তার পর প্রত্যেক ছড়ার নিজের মধ্যেও ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। বেশ বুঝা যায় অধিকাংশ কথাই বানানো। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, কথা বানাইতে গেলে লোকে প্রমাণের প্রাচুর্য দ্বারা সেটাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলে; অথচ এ ক্ষেত্রে সে পক্ষে খেয়ালমাত্র নাই। ইহাদের কথা সত্যও নহে মিথ্যাও নহে; দুইয়ের বার। ঐ যে ছড়ার এক জায়গায় সুবলের বিবাহের উল্লেখ আছে, সেটা কিছু অসম্ভব ঘটনা নহে। কিন্তু সত্য বলিয়াও বোধ হয় না। 'দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইকো বাড়ি। সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি॥' যেমনি সুবলের নামটা মুখে আসিল অমনিই বাহির হইয়া গেল— 'আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে' সে কথাটাও স্থায়ী হইল না, অনতিবিলম্বেই দিগ্‌নগরের দীর্ঘকেশা মেয়েদের কথা উঠিল। স্বপ্নেও ঠিক এইরূপ ঘটে। হয়তো শব্দসাদৃশ্য অথবা অন্য কোনো অলীক তুচ্ছ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে একটা কথা হইতে আর-একটা কথা রচিত হইয়া উঠিতে থাকে। মুহূর্তকাল পূর্বে তাহাদের সম্ভাবনার কোনোই কারণ ছিল না, মুহূর্তকাল পরেও তাহারা সম্ভাবনার রাজ্য হইতে বিনা চেষ্টায় অপসৃত হইয়া যায়। সুবলের বিবাহকে যদি-বা পাঠকগণ তৎকালীন ও তৎস্থানীয় কোনো সত্য ঘটনার আভাস বলিয়া জ্ঞান করেন, তথাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, 'নাল গামছা দিয়ে টিয়ের মার বিয়ে' কিছুতেই সাময়িক ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। কারণ, বিধবাবিবাহ টিয়েজাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও নাল-গামছার ব্যবহার উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কস্মিন্ কালে শুনা যায় নাই। কিন্তু যাহাদের কাছে ছন্দের তালে তালে সুমিষ্ট কণ্ঠে এই-সকল অসংলগ্ন অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তাহারা বিশ্বাসও করে না, সন্দেহও করে না, তাহারা মনশ্চক্ষে স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষবৎ ছবি দেখিয়া যায়।

বালকেরা ছবিও অতিশয় সহজে স্বল্পায়োজনে দেখিতে পায়। বালক যত সহজে ইচ্ছামাত্রই সৃজন করিতে পারে আমরা তেমন পারি না। ভাবিয়া দেখো, একটা গ্রন্থিবাঁধা বস্ত্রখণ্ডকে মুণ্ডবিশিষ্ট মনুষ্য কল্পনা করিয়া তাহাকে আপনার সন্তানরূপে পালন করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমাদের একটা মূর্তিকে মানুষ বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে ঠিক সেটাকে মানুষের মতো গড়িতে হয়—

যেখানে যতটুকু অনুকরণের ত্রুটি থাকে তাহাতেই আমাদের কল্পনার ব্যাঘাত করে। বহির্জগতের জড়ভাবের শাসনে আমরা নিয়ন্ত্রিত ; আমাদের চক্ষে যাহা পড়িতেছে আমরা কিছুতেই তাহাকে অন্যরূপে দেখিতে পারি না। কিন্তু শিশু চক্ষে যাহা দেখিতেছে, তাহাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া আপন মনের মতো জিনিস মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে, মনুষ্যমূর্তির সহিত বস্ত্রখণ্ডরচিত খেলনকের কোনো বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষে পড়ে না, সে আপনার ইচ্ছারচিত সৃষ্টিকেই সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দেখে।

কিন্তু তথাপি ছড়ার এই-সকল অযত্নরচিত চিত্রগুলি কেবল যে বালকের সহজ সৃজনশক্তি দ্বারা সৃজিত হইয়া উঠে তাহা নহে ; তাহার অনেক স্থানে রেখার এমন সুস্পষ্টতা আছে যে, তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় ত্বরিত-চিত্র আনিয়া উপস্থিত করে।

এই ছবিগুলি একটি-রেখা একটি-কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়। অংশ যোজনা করিয়া কিছু গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। ‘চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌ চিক্‌ করে,’ এই একটিমাত্র কথায় একটি বৃহৎ অনুর্বর মাঠ মধ্যাহ্নের রৌদ্রালোকে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হয়।

‘পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।’ ডুরে শাড়ির ডোরা রেখাগুলি ঘূর্ণাজলের আবর্তধারার মতো তনুগাত্রযষ্টিকে যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া ধরে, তাহা ঐ এক ছত্রে এক মুহূর্তে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পাঠান্তরে আছে, ‘পরনে তার ডুরে কাপড় উড়ে পড়েছে’—সে ছবিটিও মন্দ নহে।—

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগদিপাড়া দিয়ে।
বাগদিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে॥

ঐ শেষ ছত্রে জাল মুড়ি দিয়া বাগদিদের ছেলেটা যেখানে-সেখানে পড়িয়া কিরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছে সে ছবি পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক কিছু নহে, ঐ জাল মুড়ি দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগদি-সন্তানের ঘুম বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাই॥
এ নদীর জলটুকু টল্‌মল্‌ করে।

এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

দোলায় করিয়া ছয় পণ কড়ি গুনিতে গুনিতে যাওয়াকে যদি পাঠকেরা ছবির হিসাবে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, তথাপি শেষ তিন ছত্রকে তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন না। নদীর জলটুকু টল্‌মল্‌ করিতেছে এবং তীরের বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বালুতটবর্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত সরল অথচ সুস্পষ্ট ছবি আর কী হইতে পারে।

এই তো এক শ্রেণীর ছবি গেল। আর-এক শ্রেণীর ছবি আছে যাহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়। হয়তো একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বঙ্গগৃহ বঙ্গসমাজ সজীব হইয়া উঠিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সে-সমস্ত তুচ্ছ কথা বড়ো বড়ো সাহিত্যে তেমন সহজে তেমন অবাধে তেমন অসংকোচে প্রবেশ করিতে পারে না ; এবং প্রবেশ করিলেও আপনিই তাহার রূপান্তর ও ভাবান্তর হইয়া যায়।

দাদা গো দাদা শহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও॥
দাদার গলায় তুলসীমালা।
বউ বরনে চন্দ্রকলা॥
হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি॥

দাদার বেতন অধিক নহে, কিন্তু বোনটির মতে তাহাই প্রচুর। এই তিন টাকা বেতনের সচ্ছলতার উদাহরণ দিয়াই ভগ্নীটি অনুনয় করিতেছেন—

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি॥

চতুরা বালিকা নিজের এই স্বার্থ-উদ্ধারের জন্য দাদাকেও প্রলোভনের ছলে আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে, ‘বউ বরনে চন্দ্রকলা।’ যদিও ভগ্নীর খেলনাটি তিন টাকা বেতনের পক্ষে অনেক মহার্ঘ্য, তথাপি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই, এবং সেটা কেবলমাত্র সৌভ্রাত্রবশত নহে।

উলু উলু মাদারের ফুল।
বর আসছে কত দূর॥

বর আসছে বাগনাপাড়া।
বড়ো বউ গো রান্না চড়া॥
ছোটো বউ লো জল্‌কে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা।
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা॥
ফুলের বরন কড়ি
ন'টে শাকের বড়ি॥

জামাতৃসমাগম-প্রত্যাশিনী পল্লীরমণীগণের ঔৎসুক্য এবং আনন্দ-উৎসবের ছবি আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উপলক্ষে শেওড়াগাছের বেড়া দেওয়া পাড়াগাঁয়ের পথ ঘাট বন পুষ্করিণী ঘটকক্ষ বধূ এবং শিথিলগুণ্ঠন ব্যস্তসমস্ত গৃহিণীগণ ইন্দ্রজালের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে।

এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সমস্ত অধিক পরিমাণে উদ্‌ধৃত করিতে আশঙ্কা করি ; কারণ, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

ছবি যদি কিছু অদ্ভুতগোছের হয় তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালোই। কারণ, নূতনত্বে চিত্তে আরো অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছু নাই, কারণ তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সে এখনো জগতে সম্ভাব্যতার শেষসীমাবর্তী প্রাচীরে গিয়া চারি দিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে, যদি কিছুই সম্ভব হয় তবে সকলই সম্ভব। একটা জিনিস যদি অদ্ভুত না হয় তবে আর-একটা জিনিসই বা কেন অদ্ভুত হইবে। সে বলে, একমুণ্ডওয়ালা মানুষকে আমি কোনো প্রশ্ন না করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি, কারণ সে আমার নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ; দুইমুণ্ডওয়ালা মানুষের সম্বন্ধেও আমি কোনো বিরুদ্ধ প্রশ্ন করিতে চাহি না, কারণ আমি তো তাহাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। আবার স্কন্ধকাটা মানুষও আমার পক্ষে সমান সত্য, কারণ সে তো আমার অনুভবের অগম্য নহে। একটি গল্প আছে, কোনো লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিল, আজ পথে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া আসিলাম ; বিবাদে একটি লোকের মুণ্ড কাটা পড়িল, তথাপি সে দশ পা চলিয়া গেল। সকলেই আশ্চর্য হইয়া কহিল, বল কী হে, দশ পা চলিয়া গেল? তাঁহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি বলিলেন, দশ পা চলা কিছুই আশ্চর্য নহে, উহার সেই প্রথম পা চলাটাই আশ্চর্য।

সৃষ্টিরও সেইরূপ, প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশ্চর্য, কিছু যে হইয়াছে ইহাই প্রথম বিস্ময় এবং পরম বিস্ময়ের বিষয়, তাহার পরে আরো যে কিছু হইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য কী। বালক সেই প্রথম আশ্চর্যটার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করিতেছে— সে চক্ষু মেলিবামাত্র দেখিতেছে অনেক জিনিস আছে, আরো অনেক জিনিস থাকাও তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে ; এইজন্য ছড়ার দেশে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমানাঘটিত কোনো বিবাদ নাই।

আয় রে আয় টিয়ে।
নায়ে ভরা দিয়ে॥
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে॥
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা॥

প্রথমত, টিয়ে পাখি নৌকা চড়িয়া আসিতেছে, এমন দৃশ্য কোনো বালক তাহার পিতার বয়সেও দেখে নাই ; বালকের পিতার সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কিন্তু সেই অপূর্বতাই তাহার প্রধান কৌতুক। বিশেষত, হঠাৎ যখন অগাধ জলের মধ্য হইতে একটা স্ফীতকায় বোয়াল মাছ উঠিয়া, বলা নাই কহা নাই, খামকা তাহার নৌকাখানা লইয়া চলিল, এবং ক্রুদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত টিয়া মাথার রোঁয়া ফুলাইয়া পাখা ঝাপটাইয়া অত্যুচ্চ চীৎকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকিল, তখন কৌতুক আরো বাড়িয়া উঠে। টিয়ে বেচারার দুর্গতি এবং জলচর প্রাণীটার নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার দেখিয়া অকস্মাৎ ভোঁদড়ের দুর্নিবার নৃত্যস্পৃহাও বড়ো চমৎকার। এবং সেই আনন্দনর্তনপর নিষ্ঠুর ভোঁদড়টিকে নিজের নৃত্যবেগ সংবরণপূর্বক খোকার নৃত্য দেখিবার জন্য ফিরিয়া চাহিতে অনুরোধ করার মধ্যেও বিস্তর রস আছে। যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলেই তাহাকে গানে বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে, তেমনি এই-সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায়, এ-সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া— ইহাদের বাল্য সরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে, এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায়, এবং বোধ করি সর্বত্রই দুর্লভ।

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীরনদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে॥
খোকা ব'লে পাখিটি কোন্‌ বিলে চরে।
খোকা ব'লে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে॥

ক্ষীরনদীর কূলে মাছ ধরিতে গিয়া খোকা যে কী সংকটেই পড়িয়াছিল

তাহা কি তুলি দিয়া না আঁকিলে মনের ক্ষোভ মেটে। অবশ্য, ক্ষীরনদীর ভূগোলবৃত্তান্ত খোকাবাবু আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালো জানেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নদীতেই হোক, তিনি যে প্রাজ্ঞোচিত ধৈর্যাবলম্বন করিয়া পরম গম্ভীরভাবে নিজ আয়তনের চতুর্গুণ দীর্ঘ এক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট কৌতুকাবহ, তাহার উপর যখন জল হইতে ড্যাবা চক্ষু মেলিয়া একটা অত্যন্ত উৎকট-গোছের কোলা ব্যাঙ খোকার ছিপ লইয়া টান মারিয়াছে এবং অন্য দিকে ডাঙা হইতে চিল আসিয়া মাছ ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখন তাঁহার বিব্রত বিস্মিত ব্যাকুল মুখের ভাব—একবার-বা প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিপ লইয়া টানাটানি, একবার-বা সেই উড্ডীন চোরের উদ্দেশে দুই উৎসুক ব্যগ্র হস্ত ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ—এ-সমস্ত চিত্র সুনিপুণ সহৃদয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।

আবার খোকার পক্ষীমূর্তিও চিত্রের বিষয় বটে। মস্ত একটা বিল চোখে পড়িতেছে। তাহার ওপারটা ভালো দেখা যায় না। এপারে তীরের কাছে একটা কোণের মতো জায়গায় বড়ো বড়ো ঘাস, বেতের ঝাড় এবং ঘন কচুর সমাবেশ; জলে শৈবাল এবং নালফুলের বন; তাহারই মধ্যে লম্বচঞ্চু দীর্ঘপদ গম্ভীরপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ গোটাকতক বক-সারসের সহিত মিশিয়া খোকাবাবু ডানা গুটাইয়া নতশিরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে চরিয়া বেড়াইতেছেন, এ দৃশ্যটিও বেশ—এবং বিলের অনতিদূরে ভাদ্রমাসের জলমগ্ন পক্বশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের সংলগ্ন একটি কুটির; সেই কুটিরপ্রাঙ্গণে বাঁশের বেড়ার উপরে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বিলের অভিমুখে সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরাহ্নের অবসান-সূর্যালোকে জননী তাঁহার খোকাবাবুকে ডাকিতেছেন; বেড়ার নিকটে ঘরে-ফেরা বাঁধা গোরুটিও স্তিমিত কৌতূহলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এবং ভোজনতৃপ্ত খোকাবাবু নালবন-শৈবালবনের মাঝখানে হঠাৎ মায়ের ডাক শুনিয়া সচকিতে কুটিরের দিকে চাহিয়া উড়ি-উড়ি করিতেছে, সেও সুন্দর দৃশ্য—এবং তাহার পর তৃতীয় দৃশ্যে পাখিটি মার বুকে গিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ লুটাইয়াছে এবং দুই ডানায় তাঁহাকে অনেকটা ঝাঁপিয়া ফেলিয়াছে এবং নিমীলিতনেত্রে মা দুই হস্তে সুকোমল ডানা সুদ্ধ তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিবিড় স্নেহবন্ধনে বুকে বাঁধিয়া ধরিয়াছেন, সেও সুন্দর দেখিতে হয়।

জ্যোতির্বিদ্‌গণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান, সেই জ্যোতির্ময় বাষ্পরাশির মধ্যে মধ্যে এক-এক জায়গায় যেন বাষ্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকা-রাশির মধ্যেও সহসা স্থানে স্থানে সেইরূপ অর্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্তি দৃষ্টিপথে পড়ে। সেই-সকল নবীনসৃষ্ট কল্পনামণ্ডলের মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই—প্রথম বয়সের শিশু-পৃথিবীর ন্যায় এখনো সে কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় আছে, কঠিন হইয়া উঠে নাই। একটা উদ্‌ধৃত করি—

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ॥
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ॥
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু; এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ॥
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ॥
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতিনের ঘর॥
জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ॥
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥

কবিসম্প্রদায় কবিত্বসৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে বিবিধ ভাষায় বিচিত্র ছন্দে নারীজাতির স্তবগান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু উপরি-উদ্‌ধৃত স্তবগানের মধ্যে যেমন একটি সরল সহজ ভাব এবং একটি সরল সহজ চিত্র আছে, এমন অতি অল্প কাব্যেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটুখানি সরল কৌতুকও আছে। সীতার ধনুক-ভাঙা এবং দ্রৌপদীর লক্ষ্যবেধ পণ খুব কঠিন পণ ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সরলা কন্যাটি যে পণ করিয়া বসিয়াছে, সেটি তেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীতে এত কালো

ধলো রাঙা মিষ্টি আছে যে, তাহার মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র নমুনা দেখাইয়া এমন কন্যা লাভ করা ভাগ্যবানের কাজ। আজকাল কলির শেষ দশায় সমস্ত পুরুষের ভাগ্য ফিরিয়াছে ; ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষবেধ, বিচারে জয়—এ-সমস্ত কিছুই আবশ্যক হয় না ; উল্‌টিয়া তাঁহারাই কোম্পানির কাগজ পণ করিয়া বসেন এবং সেই কাপুরুষোচিত নীচতার জন্য তিলমাত্র আত্মগ্লানি অনুভব করেন না। ইহা অপেক্ষা, আমাদের আলোচিত ছড়াটির নায়কমহাশয়কে যে সামান্য সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কন্যা লাভ করিতে হইয়াছিল, সেও অনেক ভালো। যদিও পরীক্ষার শেষ ফল উক্ত ছড়াটির মধ্যে পাওয়া যায় নাই, তথাপি অনুমানে বলিতে পারি লোকটি পুরা নম্বর পাইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক শ্লোকের চারিটি উত্তরের মধ্যে চতুর্থ উত্তরটি দিব্য সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষয়িত্রী যখন স্বয়ং সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, তখন সে উত্তরগুলি জোগানো আমাদের নায়কের পক্ষে যে কিছুমাত্র কঠিন হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, ও যেন ঠিক বই খুলিয়া উত্তর দেওয়ার মতো। কিন্তু সেজন্য নিষ্ফল ঈর্ষা প্রকাশ করিতে চাহি না। যিনি পরীক্ষক ছিলেন তিনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমাদের আর-কিছু বলিবার নাই।

প্রথম ছত্রেই কন্যা কহিতেছেন, 'জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।' ইহা হইতে বোধ হইতেছে, পরীক্ষা আরো পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে এবং পরীক্ষার্থী এমন মনের মতন আনন্দজনক উত্তরটি দিয়াছে যে, কন্যার প্রশ্নজিজ্ঞাসার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক এমন রঙ্গ আর-কিছু নাই।

যাহা হউক, আমাদের উপরে এই ছড়াটি রচনার ভার থাকিলে খুব সম্ভব ভূমিকাটা রীতিমত ফাঁদিয়া বসিতাম ; এমন আচমকা মাঝখানে আরম্ভ করিতাম না। প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি-বা ঠিক সেনেট-হলের মতো না হইত, অনেকটা ইডন্ গার্ড্‌নের অনুরূপ হইতে পারিত। এবং তাহার সহিত জ্যোৎস্নার আলোক, দক্ষিণের বাতাস এবং কোকিলের কুহুধ্বনি যোগ করিয়া ব্যাপারটাকে বেশ একটুখানি জমজমাট করিয়া তুলিতাম—আয়োজন অনেক রকম করিতে পারিতাম, কিন্তু এই সুন্দর কন্যাটি—যাহার মাথার কেশ ফিঙের অপেক্ষা কালো, হাতের শাঁখা রাজহংসের অপেক্ষা ধলো, সিঁথার সিঁদুর কুসুমফুলের অপেক্ষা রাঙা, স্নেহের কোল ছেলেদের কথার অপেক্ষা মিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল শীতল জলের অপেক্ষা স্নিগ্ধ, সেই মেয়েটি—যে মেয়ে সামান্য কয়েকটি স্তুতিবাক্য শুনিয়া সহজ বিশ্বাসে ও সরল আনন্দে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আমাদের সেই বর্ণনাবহুল মার্জিত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে এমন করিয়া চিরকালের মতো ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না।

কেবল এই ছড়াটি কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা অধিকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া নূতন সংস্করণের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমন-কি, উহাদের মধ্যে সর্বজনবিদিত নীতি এবং সর্বজনদুর্বোধ তত্ত্বজ্ঞানেরও বাসা নির্মাণ করিতে পারি। কিছু না হউক, উহাদিগকে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা যদি কখনো আমাদের বর্তমান সভাসমাজে চাঁদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ইচ্ছা করি, তবে কি তাহাকে নিম্নলিখিতরূপে তুচ্ছ প্রলোভন দেখাইতে পারি।

আয় আয় চাঁদা মামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥

এ কোন্ চাঁদ। নিতান্তই বাঙালির ঘরের চাঁদ। এ আমাদের বাল্য-সমাজের সর্বজ্যেষ্ঠ সাধারণ মাতুল চাঁদা। এ আমাদের গ্রামের কুটিরের নিকটে বায়ু-আন্দোলিত বাঁশবনের রন্ধ্রগুলির ভিতর দিয়া পরিচিত স্নেহহাস্যমুখে প্রাঙ্গণধূলিলুণ্ঠিত উলঙ্গ শিশুর খেলা দেখিয়া থাকে ; ইহার সঙ্গে আমাদের গ্রামসম্পর্ক আছে। নতুবা এত বড়ো লোকটা—যিনি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রসুন্দরীর অন্তঃপুরে বর্ষ যাপন করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত সুরলোকের সুধারস আপনার অক্ষয় রৌপ্যপাত্রে রাত্রিদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—সেই শশলাঞ্ছন হিমাংশুমালীকে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, কালো গোরুর দুধ খাবার বাটির প্রলোভন দেখাইতে কে সাহস করিত। আমরা হইলে বোধ করি পারিজাতের মধু, রজনীগন্ধার সৌরভ, বউ-কথা-কও'এর গান, মিলনের হাসি, হৃদয়ের আশা, নয়নের স্বপ্ন, নববধূর লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ অপূর্বজাতীয় দুর্লভ পদার্থের ফর্দ করিয়া বসিতাম—অথচ চাঁদ তখনো যেখানে ছিল এখনো সেইখানেই থাকিত। কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিত না—খোকার কপালে টী দিয়া যাইবার

জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করিত না। সুতরাং ভান্ডারে যাহা মজুত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে, কবিত্বের উৎসাহে তাহার অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছু স্বীকার করিয়া বসিতে পারিত না। আমাদের বাংলাদেশের চাঁদামামা বাংলাদেশের সহস্র কুটির হইতে সুকণ্ঠের সহস্র নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া চুপিচুপি হাস্য করিত; হাঁ-ও বলিত না, না-ও বলিত না, এমন ভাব দেখাইত যেন কোন্ দিন, কাহাকেও কিছু সংবাদ না দিয়া, পূর্বদিগন্তে যাত্রারম্ভ করিবার সময়, অমনি পথের মধ্যে কৌতুক-প্রফুল্ল পরিপূর্ণ হাস্যমুখখানি লইয়া ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল— অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম পদচিহ্নরেখা-সমেত পাথর হইয়া গিয়াছে— সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে— কেহ খোন্তা দিয়া খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই— তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কত কালের এক টুকরা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহু-দূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।

‘ও পারেতে কালো রঙ,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে॥’
‘এ ’মাসটা থাক্, দিদি কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে॥’
‘হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥’

এই অন্তর্ব্যথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রুজলোচ্ছ্বাস কোন্ কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে, কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল। এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোনো চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশ্য দীর্ঘনিশ্বাসের মতো বায়ুস্রোতে বিলীন হইয়াছে। এটা কেমন করিয়া দৈবক্রমে একটি শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ঝম্।

এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেমন না করিয়া থাকিতে পারে না। চিরকালই এমনি হইয়া আসিতেছে। বহুপূর্বে উজ্জয়িনী-রাজসভার মহাকবিও বলিয়া গিয়াছেন :

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
… … … কিং পুনর্দূরসংস্থে।

কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে :

গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।
হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।—

ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্মান্তিক কাহিনী, সমস্ত দুর্বিষহ বেদনা-পরম্পরা কে বলিয়া দিবে। দিনে-দিনে রাত্রে-রাত্রে মুহূর্তে-মুহূর্তে কত সহ্য করিতে হইয়াছিল— এমন সময়, সেই স্নেহস্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে— হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে। সেই ঘর, সেই খেলা, সেই বাপ মা, সেই সুখশৈশব, সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি একদন্ড দুরন্ত উতলা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায়। সেদিন কিছুতে আর একটি মাসের প্রতীক্ষাও প্রাণে সহিতেছিল না— বিশেষত, সেদিন নদীর ওপার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল, বৃষ্টি ঝম্ঝম্ করিয়া পড়িতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃষ্টিধারামুখরিত মেঘচ্ছায়াশ্যামল কূলে-কূলে-পরিপূর্ণ অগাধ শীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনি হাড়ের ভিতরকার জ্বালাটা নিবাইয়া আসি।— ইহার মধ্যে একটি ব্যাকরণের ভুল আছে, সেটিকে বঙ্গভাষার সতর্ক অভিভাবকগণ মার্জনা করিবেন, এমন-কি, তাহার উপরেও একবিন্দু অশ্রুপাত করিবেন। ভাইয়ের প্রতি ‘গুণবতী’ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উক্ত অজ্ঞাতনাম্নী কন্যাটি অপরিমেয় মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছিল। সে হতভাগিনী স্বপ্নেও জানিত না তাহার সেই একটি দিনের মর্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির সহিত এই ব্যাকরণের

ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে। জানিলে লজ্জায় মরিয়া যাইত। হয়তো ভুলটি গুরুতর নহে ; হয়তো ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইতেছে, এমনও হইতে পারে। সম্প্রতি যাঁহারা বঙ্গভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাব্রতে ভাষাগত প্রথা এবং পুরাতন সৌন্দর্যগুলিকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশত আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্যাকরণ-লঙ্ঘন-পূর্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন, এমন-কি, পত্নীশ্রেণীর সম্পর্কের দ্বারা প্রীতিপূর্ণ ভ্রাতৃসম্বোধনে অভিহিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন না।

আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজননীর এই মর্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে॥
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
সেই-যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই-যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্ধুক সাজায়ে॥
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে।
সেই-যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে॥
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই-যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই-যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা-সাজিয়ে॥
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
সেই-যে বোন—

এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাঁহার পূর্বব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভালো, তথাপি সাধারণত এরূপ কলহ নিত্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণরস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে 'ভর্তৃখাদিকা' বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম।

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে।
সেই-যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী ব'লে॥

মা অলংকার দিয়াছেন, বাপ অর্থ দিয়াছেন, মাসি ভাত খাওয়াইয়াছেন, পিসি দুধ খাওয়াইয়াছেন, ভাই কাপড় কিনিয়া দিয়াছেন ; আশা করিয়াছিলাম এমন স্নেহের পরিবারে ভগিনীও অনুরূপ কোনো প্রিয় কার্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হঠাৎ শেষ ছত্রটা পড়িয়াই বক্ষে একটা আঘাত লাগে এবং চক্ষুও ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠে। মা-বাপের পূর্বতন স্নেহব্যবহারের সহিত বিদায়কালীন রোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে—তাহা প্রত্যাশিত। কিন্তু যে ভগিনী সর্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথ্য গালি দিত, বিদায়কালে তাহার কান্না যেন সবচেয়ে সকরুণ। হঠাৎ আজ বাহির হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত দ্বন্দ্বকলহের মাঝখানে একটি সুকোমল স্নেহ গোপনে সঞ্চিত হইতেছিল—সেই অলক্ষিত স্নেহ সহসা সুতীব্র অনুশোচনার সহিত আজ তাহাকে বড়ো কঠিন আঘাত করিল। সে খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্যকালে এই এক খাটে তাহারা দুই ভগিনী শয়ন করিত, এই শয়নগৃহই তাহাদের সমস্ত কলহ-বিবাদ এবং সমস্ত খেলাধুলার লীলাক্ষেত্র ছিল। বিচ্ছেদের দিনে এই শয়ন-ঘরে আসিয়া, এই খাটের খুরা ধরিয়া নির্জনে গোপনে দাঁড়াইয়া ব্যথিত বালিকা যে ব্যাকুল অশ্রুপাত করিয়াছিল, সেই গভীর স্নেহ-উৎসের নির্মল জলধারায় কলহভাষার সমস্ত কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া শুভ্র হইয়া গিয়াছে।

এই-সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি ছত্রে একটি কথায় সুখদুঃখের এক-একটি

বড়ো বড়ো অধ্যায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে যে ছড়াটি উদ্‌ধৃত করিতেছি তাহার দুই ছত্রে আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কতদিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে।

দোল্‌ দোল্‌ দুলদুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি।
কেঁদে কেন মরো।
আপনি বুঝিয়া দেখো
কার ঘর করো॥

একটি শিশুকন্যাকেও দোল দিতে দিতে দূরভবিষ্যৎবর্তী বিচ্ছেদসম্ভাবনা স্বতই মনে উদয় হয় এবং মায়ের চক্ষে জল আসে। তখন একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে, এমনি চিরদিন হইয়া আসিতেছে। তুমিও একদিন মাকে কাঁদাইয়া পরের ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলে—আজিকার সংসার হইতে সেদিনকার নিদারুণ বিচ্ছেদের সেই ক্ষতবেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে—তোমার মেয়েও যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং সে দুঃখও বিশ্বজগতে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

পুটুর শ্বশুরবাড়ি-প্রয়াণের অনেক ছবি এবং অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সে কথাটা সর্বদাই মনে লাগিয়া আছে।

পুটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে।
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে॥
আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিনসে কাহার দেব পালকি বহাতে॥
সরু ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে॥

শেষ ছত্র দেখিলেই বিদিত হওয়া যায়, শাশুড়ি কিসে ভুলিবে এই পরম দুশ্চিন্তা তখনো সম্পূর্ণ ছিল। উক্ত উড়কিধানের মুড়কি দ্বারাই সেই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করা যাইত এ কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে নিঃসন্দেহ এখনকার অনেক কন্যার মাতা সেই সত্যযুগের জন্য গভীর দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে আক্ষেপ করিবেন। এখনকার দিনে কন্যার শাশুড়িকে যে কী উপায়ে ভুলাইতে হয় কন্যার পিতা তাহা ইহজন্মেও ভুলিতে পারেন না।

কন্যার সহিত বিচ্ছেদ একমাত্র শোকের কারণ নহে, অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ, সেও একটা বিষম শেল। অথচ অনেক সময় জানিয়া-শুনিয়া মা-বাপ এবং আত্মীয়েরা স্বার্থ অথবা ধন অথবা কুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিরুপায় বালিকাকে অপাত্রে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সেই অন্যায়ের বেদনা সমাজ মাঝে মাঝে প্রকাশ করে। ছড়ায় তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু পাঠকদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছড়ার সকল কথাই ভাঙাচোরা, হাসিতে কান্নাতে অশ্রুতে মেশানো।

ডালিম গাছে পর্‌ভু নাচে।
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্দি বাজে॥
আয়ী গো চিন্‌তে পারো?
গোটা-দুই অন্ন বাড়ো॥
অন্নপূর্ণা[1] দুধের সর।
কাল যাবো গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মাল্লে চড়।
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥
হেই খুড়ো, তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয় গা মায়ের বাড়ি॥
মায়ে দিল সরু শাঁখা, বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিল হুড়কো ঠেঙা, চল্‌ শ্বশুরবাড়ি॥

তখন ইংরাজের আইন ছিল না। অর্থাৎ দাম্পত্য-অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার পাহারাওয়ালার হাতে ছিল না। সুতরাং আত্মীয়গণকে উদ্যোগী হইয়া সেই কাজটা যথাসাধ্য সহজে এবং সংক্ষেপে সাধন করিতে হইত। কিন্তু হাল নিয়মেই হউক আর সাবেক নিয়মেই হউক, নিতান্ত পাশব বলের দ্বারা অসহায়া কন্যাকে অযোগ্যের সহিত যোজনা—এতবড়ো অস্বাভাবিক বর্বর নৃশংসতা জগতে আর আছে কিনা সন্দেহ।

বাপ-মায়ের অপরাধ সমাজ বিস্মৃত হইয়া আসে, কিন্তু বুড়ো বরটা তাহার চক্ষুশূল। সমাজ সুতীব্র বিদ্রূপের দ্বারা তাহার উপরেই মনের সমস্ত আক্রোশ মিটাইতে থাকে।

তালগাছ কাটম্‌ বোসের বাটম্‌ গৌরী এল[2] ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী॥

টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম, কানে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি॥
চোখ খাও গো বাপ মা, চোখ খাও গো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক-খেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে—
বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে॥

বৃদ্ধের এমন লাঞ্ছনা আর কী হইতে পারে।

এক্ষণে বঙ্গগৃহের যিনি সম্রাট—যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম সেই মহামহিম খোকা-খুকু বা খুকুনের কথাটা বলা বাকি আছে।

প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত—আর, মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা এবং পুঁটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি।

প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণে মানব-রচনার সর্বপ্রথম। সে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাষ্পলেশশূন্য তীব্র মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের মধ্যেও মানবহৃদয়ের নবীন অরুণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।

এই চিরপুরাতন নব-বেদের মধ্যে যে স্নেহগাথা, যে শিশুস্তবগুলি রহিয়াছে তাহার বৈচিত্র্য সৌন্দর্য এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আর সীমা নাই। মুগ্ধহৃদয়া বন্দনাকারিণীগণ নব নব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক খুকু-দেবতার কত মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—সে কখনো পাখি, কখনো চাঁদ, কখনো মানিক, কখনো ফুলের বন।

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

ভালোবাসার মতো এমন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আর কিছুই নাই। সে আরম্ভকাল হইতে এই সৃষ্টির আদি-অন্তে অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি সৃষ্টির নিয়ম সমস্তই লঙ্ঘন করিতে চায়। সে যেন সৃষ্টির লৌহ-পিঞ্জরের মধ্যে আকাশের পাখি। শতসহস্র বার প্রতিষেধ প্রতিরোধ প্রতিবাদ প্রতিঘাত পাইয়াও তাহার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না যে, সে অনায়াসেই নিয়ম না মানিয়া চলিতে পারে। সে মনে মনে জানে, আমি উড়িতে পারি, এইজন্যই সে লোহার শলাকাগুলোকে বারম্বার ভুলিয়া যায়। ধনকে লইয়া

বনকে যাইবার কোনো আবশ্যক নাই, ঘরে থাকিলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অবশ্য বনে অনেকটা নিরালা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বিশেষত নিজেই স্বীকার করিতেছে সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য দ্রব্যের অসম্ভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু তবু ভালোবাসা জোর করিয়া বলে, তোমরা কি মনে কর আমি পারি না। তাহার এই অসংকোচ স্পর্ধাবাক্য শুনিয়া আমাদের মতো প্রবীণবুদ্ধি বিবেচক লোকেরও হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায় ; আমরা বলি, তাও তো বটে, কেনই বা না পারিবে। যদি কোনো সংকীর্ণহৃদয় বস্তুজগৎবদ্ধ সংশয়ী জিজ্ঞাসা করে খাইবে কী, সে তৎক্ষণাৎ অম্লানমুখে উত্তর দেয়, 'নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।' শুনিবামাত্র আমরা মনে করি, ঠিক সংগত উত্তরটি পাওয়া গেল। অন্যের মুখে যাহা ঘোরতর স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা, যাহা উন্মাদের অত্যুক্তি, ভালোবাসার মুখে তাহা অবিসম্বাদিত প্রামাণিক কথা।

ভালোবাসার আর-একটি গুণ এই যে, সে এককে আর করিয়া দেয়, ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ-সীমা মানিতে চাহে না। পাঠক পূর্বেই তাহার উদাহরণ পাইয়াছেন—দেখিয়াছেন একটা ছড়ায় কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া খোকাকে অনায়াসেই পক্ষীজাতীয়ের সামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোনো প্রাণিবিজ্ঞানবিৎ তাহাতে আপত্তি করিতে আসেন না। আবার পরমুহূর্তেই খোকাকে যখন আকাশের চন্দ্রের অভেদ আত্মীয়রূপে বর্ণনা করা হয় তখন কোনো জ্যোতির্বিৎ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায় যখন সে আড়ম্বরপূর্বক যুক্তির অবতারণা করিয়া ঠিক শেষ মুহূর্তে তাহাকে অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করিয়া ভাঙিয়া ফেলে। নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

চাঁদ কোথা পাব বাছা, জাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয়° গ'ড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয়° পেড়ে দেব,
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব।
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমো রে আমার খোকামণি।

চাঁদ আয়ত্তগম্য নহে, চাঁদ মাটির গড়া নহে, গাছের ফল নহে—এ সমস্তই বিশুদ্ধ যুক্তি, অকাট্য এবং নূতন—ইহার কোথাও কোনো ছিদ্র নাই। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত আসিয়া অবশেষে যদি খোকাকে বলিতে হয় যে, তুমিই চাঁদ এবং তুমি সকল চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ, তবে তো মাটির চাঁদও সম্ভব, গাছের চাঁদও

আশ্চর্য নহে। তবে গোড়ায় যুক্তির কথা পাড়িবার প্রয়োজন কী ছিল।

এইখানে বোধ করি একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায় তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালোবাসারই একাধিপত্য। ভালোবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে, আমার অপেক্ষা আর-কিছু কেন প্রধান হইবে। আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়াই বিশ্বনিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না। সে স্বপ্ন দেখিতেছে এখনো সে স্বর্গেই আছে। কিন্তু হায়, মর্ত পৃথিবীতে স্বর্গের মতো ঘোরতর অযৌক্তিক পদার্থ আর কী হইতে পারে। তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে, সে কেবল রমণীতে বালকে প্রেমিকে ভাবুকে মিলিয়া সমস্ত যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূল স্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী যে পৃথিবীই, এ কথা তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যায় বলিয়াই সেই ভ্রমক্রমেই পৃথিবীতে দেবলোক স্খলিত হইয়া পড়ে।

ভালোবাসা এক দিকে যেমন প্রভেদ-সীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফুলে খোকায় পাখিতে এক মুহূর্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আর-এক দিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই সেখানে আকার গড়িয়া বসে।

এপর্যন্ত কোনো প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ঘুমকে স্তন্যপায়ী অথবা অন্য কোনো জীবশ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই। কিন্তু ঘুম নাকি খোকার চোখে আসিয়া থাকে, এইজন্য তাহার উপরে সর্বদাই ভালোবাসার সৃজনহস্ত পড়িয়া সেও কখন একটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম পথে পথে ফেরে।
চার কড়া দিয়ে কিনলেম ঘুম,
মণির চোখে আয় রে॥

রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন তো আর হাটে ঘাটে লোক নাই। সেইজন্য সেই হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম নিরাশ্রয় হইয়া অন্ধকারে পথে পথে মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বোধ করি সেইজন্যই তাহাকে এত সুলভ মূল্যে পাওয়া গেল। নতুবা সমস্ত রাত্রির পক্ষে চার কড়া কড়ি এখনকার কালের মজুরির তুলনায় নিতান্তই যৎসামান্য।

শুনা যায় গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঘুমকে স্বতন্ত্র মানবীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু নৃত্যকে একটা নির্দিষ্ট বস্তুরূপে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।

থেনা নাচন থেনা।
বট পাকুড়ের ফেনা॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার জাদুর জন্যে যায়ে নাচনা কিনে আন্॥

কেবল তাহাই নহে। খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা, সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।

হাতের নাচন, পায়ের নাচন, বাটা মুখের নাচন,
নাটা চক্ষের নাচন, কাঁটালি ভুরুর নাচন,
বাঁশির নাকের নাচন, মাজা বেঙ্কুর নাচন,
আর নাচন কী।
অনেক সাধন ক'রে জাদু পেয়েছি॥

ভালোবাসা কখনো অনেককে এক করিয়া দেখে, কখনো এককে অনেক করিয়া দেখে, কখনো বৃহৎকে তুচ্ছ এবং কখনো তুচ্ছকে বৃহৎ করিয়া তুলে। 'নাচো রে নাচো রে, জাদু, নাচনখানি দেখি।' নাচনখানি! যেন জাদু হইতে তাহার নাচনখানিকে পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থের মতো দেখা যায় ; যেন সেও একটি আদরের জিনিস। 'খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া।' এ স্থলে 'বেড়ু করতে' না বলিয়া 'বেড়াইতে' বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোর গৌরব হ্রাস হইত। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বেড়াইয়া থাকে, কিন্তু খোকাবাবু 'বেড়ু' করেন। উহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোটি একটু বিশেষ পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।

খোকা এল বেড়িয়ে।
দুধ দাও গো জুড়িয়ে॥
দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলেন খ্যাপ্ত॥
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে॥

অবশ্য, খোকাবাবু ভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া দুধের বাটি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন সে ঘটনাটি গৃহরাজ্যের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা, এবং তাঁহার যে নৌকারোহণে ভ্রমণের সংকল্প আছে ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য, কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া

দেখিবেন। আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজের দোকান হইতে আজানুসমুত্থিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া বেড়াই, তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র। কিন্তু খোকাবাবুর অতি ক্ষুদ্র কোমল চরণ-যুগলে ছোটো ঘুণ্টি-দেওয়া অতি ক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতাজোড়া, সেটা হইল জুতুয়া। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে জুতার আদরও অনেকটা পদসম্ভ্রমের উপরেই নির্ভর করে, তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না!

সর্বশেষে, উপসংহারকালে আর-একটি কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আছে। যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি, সেইখানেই তাহার দেবপূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালোবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। ঐ যে বলা হইয়াছে 'নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি', ইহা দেবতারই ধ্যান। শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে এমন কী আছে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য, যাহা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য অরণ্যের নিরালার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা হয়—মনে হয়, সমস্ত সংসার সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম এই আনন্দভাণ্ডার হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে! যোগীগণ যে অমৃত-লালসায় পানাহার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে অক্ষুব্ধ অবসর অন্বেষণ করিতেন, জননী নিজের সন্তানের মুখে সেই দেবদুর্লভ অমৃতরসের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহার অন্তরের উপাসনা-মন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে :

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

সেইজন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশের মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয় এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্তের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হইয়া গিয়াছে—সেও অতি সহজে, অতি অবহেলে—তাহার জন্য স্বতন্ত্র চালচিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না। শিশু-দেবতার অতি অদ্ভুত অসংগত অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন অলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া।
তেলিমাগীরা মুখ করেছে কেন রে মাখনচোরা॥
ভাঁড় ভেঙেছে, ননি খেয়েছে, আর কি দেখা পাব।
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে নেব॥

হঠাৎ তেলিমাগীদের পাড়ায় ক্ষুদ্র খোকাবাবু কখন যে বৃন্দাবনের বাঁশি আনিয়া ফেলিয়াছেন তাহা, সে বাঁশি যাহাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারিবে।

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা-গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে; এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য-বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশু-মনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

---

[১] পাঠান্তর : অন্নব্যঞ্জন
[২] পাঠান্তর : -হেন
[৩] নয় = নহে, নাহয়